গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৩
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

১৯২৪ সালের কথা। দিনটির কথা কারো মনে নেই। খুব সম্ভবত জুলাই-আগস্ট মাসের কোনো একদিন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর ভ্যাপসা গরম পড়েছে। আকাশেও মেঘ জমেছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে। ভাই-বোনরা সবাই পড়ছে। প্রীতিলতা তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে।

সবাই পড়ছে। শুধু থেমে আছে মধুসূদন। মধুসূদন প্রীতিলতার বড়দা। বড়দা'র পড়া শুনতে না পেয়ে প্রীতিলতা তাঁর দিকে তাকালেন। মধুসূদন বোনের মুখের দিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, আজ রেল শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য বিপুল অংকের টাকা ব্রিটিশ কর্মচারীরা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই গাড়িতে দুজন পুলিশও ছিল। কিন্তু হঠাৎ দিনের বেলায় বড় রাস্ত্মার ধারে চারজন লোক পিস্তল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামালো। তাঁরা গাড়ি থেকে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে টাকাসহ গাড়ি নিয়ে চম্পট। পরে জানা গেলো ওই লোকগুলো ডাকাত নয়, স্বদেশী। স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা কাজ করছেন। তাঁরা মৃত্যুকে পরোয়া করেন না। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা সেদিন প্রীতিলতাকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। পরবর্তীতে তিনি ব্রিটিশবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজেকে গড়ে তোলার পাশাপশি অসংখ্য বিপ্লবীদের প্রশিক্ষিত, অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে গেছেন।

ভারত উপমহাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনেক নারী পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। অনুশীলন, যুগান্ড়র প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘরে ঘরে মা, বোন, মাসিমা, কাকিমা, দিদি, বৌদিরা যুক্ত ছিলেন। যেমন ছিলেন অগ্নিযুগের প্রথম পর্বে স্বর্ণ কুমারী দেবী, সরলা দেবী, আশালতা সেন, সরোজিনী নাইডু, ননী বালা, দুকড়ি বালা, পরবর্তীকালে ইন্দুমতি দেবী (অনন্ত সিংহের দিদি), লীলা রায়, পটিয়া ধলঘাটের সাবিত্রী দেবী প্রমুখ দেশপ্রেমিক নারী। তারই ধারাবাহিকতায় সেই অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা, বীর কন্যা প্রীতিলতার আবির্ভাব।

প্রীতিলতার জন্ম ১৯১১ সালের ৫ মে। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে। এখানে জন্ম হয়েছে অসংখ্য বিপ্লবীর। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই গ্রাম ছিল বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি। প্রীতিলতার বাবার নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের প্রধান কেরানী। বাবার মৃত্যুর পর জগবন্ধু শৈশবে পৈত্রিক বাড়ী ডেঙ্গাপাড়া ত্যাগ করে মায়ের সাথে পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে চলে আসেন। ধলঘাট ছিল তাঁর মামা বাড়ি। এখানেই তিনি বড় হন এবং বসতি স্থাপন করেন।

মা প্রতিভাদেবী। তিনি ছিলেন গৃহিণী। জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ও প্রতিভাদেবীর পরিবারে ছয় সন্ড়ানের জন্ম হয়। মধুসূদন, প্রীতিলতা, কনকলতা, শান্ড়িলতা, আশালতা ও সন্ড়োষ। জগবন্ধু পরিবারের আদি পদবী ছিল দাশগুপ্ত। তাঁদের বংশের কোনো এক পূর্বপুরুষ নবাবী আমলে "ওয়াহেদেদার" উপাধি পেয়েছিলেন। সেই ওয়াহেদেদার থেকে ওয়াদ্দেদার বা ওয়াদ্দার হয়।

প্রীতিলতার পড়াশুনার হাতেখড়ি বাবা, মা'য়ের কাছে। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। যে কারণে জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার মেয়েকে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে ভর্তি না করিয়ে ডা. খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে সরসরি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করান। এটি ওই সময়ের অন্যতম নারী শিক্ষালয় ছিল। এই নামকরা স্কুলে প্রতিটি শ্রেণীতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ছিলেন। ৮ম শ্রেণীতে প্রীতিলতা বৃত্তি পান।

ওই স্কুল থেকে প্রীতিলতা ১৯২৮ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করার পর ভর্তি হন ঢাকার ইডেন কলেজে। থাকেন কলেজের ছাত্রীনিবাসে। এ সময় প্রীতিলতা বিপ্লবী লীলা নাগের সংস্পর্শে আসেন। তখন বিপ্লবী লীলা নাগের নেতৃত্বে 'দীপালী সংঘ' সংগঠনটি পরিচালিত হত। দীপালী সংঘ ছিল "শ্রীসংঘ"-এর মহিলা শাখা সংগঠন। "শ্রীসংঘ" ছিল তখনকার ঢাকার একটি বিপ্লবী দল।

অনেকদিন পর লীলা নাগের সাথে প্রীতিলতার 'দীপালী সংঘ' নিয়ে কথা হল। কথাবার্তার মাধ্যমে লীলা নাগ বুঝে নিলেন প্রীতিলতাকে দিয়ে দেশের কাজ হবে। তাই লীলা নাগ তাঁকে দীপালী সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য একটি ফর্ম দিয়ে বললেন, তুমি এর উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাথে একমত পোষণ করলে বাড়ী থেকে এসে ফর্মটি পূরণ করে দিও।

বাড়ী আসার পরের দিন তিনি ওই ফর্মটি পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে দেখিয়ে বললেন, 'দাদা' আমি এই সংঘের সাথে কাজ করবো। তোমরা তো আর আমাকে তোমাদের দলে নিবে না, তাই এখানে যুক্ত হয়ে আমি দেশের জন্য কাজ করব। 'পূর্ণেন্দু দস্তিদার ওই ফর্মটি প্রীতিলতার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, দলনেতাকে দেখিয়ে তোমাকে এটি ফেরত দিব'।

১৯২৯ সাল। তখন সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পূর্ণেন্দু দস্তিদার প্রীতিলতার কাছ থেকে ফর্মটি নেয়ার পরের দিন বিকেল বেলা বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকে উপস্থিত হলেন। বৈঠক শেষে জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে তিনি মাষ্টারদা সূর্যসেনকে ওই ফর্মটি দেখালেন এবং প্রীতিলতার মনের কথাগুলো বললেন। মাষ্টারদা সূর্যসেন সবকিছু শুনে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বললেন, 'আজ থেকে আমরা প্রীতিলতাকে আমাদের দলের সদস্য করে নিলাম। কিন্তু এই কথা আপাতত আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কাউকে জানানো যাবে না। প্রীতিলতাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো'।

আইএ পরীক্ষা শেষ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে চলে আসেন। সূর্যসেনের সাথে প্রীতিলতার ভবিষৎ কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়। কিছুদিন পর প্রীতিলতার আইএ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি পাবেন তিনি। ঠিক হলো কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশুনা করবেন। ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে বিএ ভর্তি হলেন প্রীতিলতা। থাকেন ছাত্রীনিবাসে।

এখানে মাষ্টারদার নির্দেশে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড শুরু করলেন তিনি। গড়ে তুললেন এক বিপ্লবী চক্র। এই বিপ্লবী চক্রে অনেক মেয়ে সদস্য যোগ দিলেন। তাঁদের মূল কাজই হলো অর্থ সংগ্রহ। অর্থ সংগ্রহ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে পাঠাতে লাগলেন।

কলকাতার এক গোপন কারখানায় তখন তৈরি হয় বোমার খোল। মাষ্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী সেই বোমার খোল সংগ্রহ করেন প্রীতিলতা।

১৯২৯ সালে পূজার ছুটিতে কল্পনা দত্ত, সরোজিনি পাল, নলিনী পাল, কুমুদিনী রতিকে নিয়ে প্রীতিলতা চট্টগ্রাম আসেন। বোমার খোলগুলো পৌঁছে দেন বিপ্লবীদের হাতে। মাষ্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী প্রীতিলতা এরপর প্রকাশ্য বিপ্লবী কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও তাঁকে নিতে হয়। কলকাতায় যে বিপ্লবী চক্র গঠন করা হয়েছে, তাঁদের সকল প্রকার প্রশিক্ষণও প্রীতিলতাকে দিতে হতো।

বিএ শেষ বর্ষে পড়ার সময় চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ সংঘর্ষ ও সেই যুদ্ধে তাঁর আত্মীয় শহীদ হওয়ায় লেখাপড়ায় তিনি অমনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির পর থেকে তিনি বিএ পরীক্ষা না দেয়ার জন্য মনস্থির করেন। কিন্তু তাঁর শুভাকাংক্ষীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বিএ পরীক্ষা দিয়ে ডিসটিংশনে পাস করলেন তিনি।

১৯২৮ সালে প্রীতিলতা ডা. খাস্ড়গীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এটি সেই মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার সার্টিফিকেট।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মহানায়ক সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম দখল হলো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন অচল হয়ে গেলো। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন বিকল, সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, রিজার্ভ পুলিশ ছত্রভঙ্গ ও রেললাইন উপড়ে ফেলা হলো। স্বদেশী বিপ-বীরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে ফেলেছে। এ সময় প্রীতিলতা কলকাতায়। চট্টগ্রামে আসার জন্য ব্যাকুল। সশস্ত্র বিপ-বে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্ড়ুত। কিন্তু তখনো পর্যন্ড় মাষ্টারদার অনুমতি মেলেনি।

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

নতুন প্রজন্ম এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার, যারা কাঁধে তুলে নেবে এদেশ গঠনের গুরু দায়িত্ব। জাতি হিসেবে তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার। আর তাই 'গুণীজন' কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষুদ্র চেষ্টা আমাদের।

আমাদের দেশে অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা সারাজীবন তাঁদের সৃজনশীল চিন্তা, মনন ও মেধা দিয়ে শান্তি, মানবতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন ও করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের লেখনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করছেন। অনেকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির এইসব গুণীব্যক্তিবৃন্দকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রয়াস আমাদের এই 'গুণীজন' উদ্যোগ। 'গুণীজন' উদ্যোগটি ইন্টারনেট, বই, সিডি এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে গুণীজনদেরকে পরিচিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'গুণীজন' ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.gunijan.org.bd

'গুণীজন' (www.gunijan.org.bd) ওয়েব জার্নালে রয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, গণমাধ্যম, মানবাধিকার, নারী অধিকার আন্দোলন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মুক্তিসংগ্রাম, ক্রীড়া, আদিবাসী অধিকার আন্দোলন ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র, 'সমসাময়িক' বিষয় নিয়ে তাঁদের অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। এছাড়া আরো রয়েছে গুণীজনদের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

'গুণীজন' কর্মসূচি মূলত স্বেচ্ছাশ্রম ও ব্যক্তিপর্যায়ের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত, কোন বিদেশী দাতাসংস্থার অর্থে পরিচালিত নয়। বিভিন্ন দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে ধীরে ধীরে আগ্রহ প্রকাশ করছে ও সহায়তা করছে।

গুণীজন ওয়েবসাইটে এপর্যন্ড় প্রায় ২০০ জন গুণীজনের জীবনী প্রকাশ করা হয়েছে। জীবনীর সাথে সংযোজন করা হয়েছে দুর্লভ সব আলোকচিত্র, অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। কাজ চলছে আরো একহাজারেরও বেশী গুণীজনকে নিয়ে।

যেহেতু বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটছে ধীর গতিতে, তাই বিভিন্ন মাধ্যমে 'গুণীজন'-এর প্রসার বাড়ানোর প্রয়াস চলছে। স্কুল কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকার বাইরে শিশু-কিশোরদের কাছে গুণীজনবৃন্দকে পরিচয় করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একাজে ডি.নেটের গ্রামীণ স্কুল ভিত্তিক 'কম্পিউটার শিক্ষা কর্মসূচি' ও খেলাঘরের সাথে 'গুণীজন' স্কুল কর্মসূচি যৌথভাবে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, বাংলা ভিশন, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ,রহিম আফরোজ বাংলাদেশসহ আরও বিভন্ন প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গুণীজন কর্মসূচিকে সহযোগিতা করেছে এবং করছে।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে 'গুণীজন' কর্মসূচিটি 'ওয়ার্ল্ড সামিট অ্যাওয়ার্ড ২০০৯'-এ বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে নমিনেশন প্রাপ্ত ৬০ টিরও বেশী কর্মসূচির মধ্যে ই-কালচার এন্ড হেরিটেজ বিভাগে 'গুণীজন' কর্মসূচির স্থান ছিল ষষ্ঠতম। মনথন অ্যাওয়ার্ড, ২০০৮-এ গুণীজন কর্মসূচি নমিনেশন পেয়েছিল।

'গুণীজন' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করার জন্য (প্রীতিলতা, কাঁকন বিবি, ভাষাশহীদ স্মরণে) 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

গুণীজনদের পরিচিতি দেশব্যাপী বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ায় হলো 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য।

সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'গুণীজন' পত্রিকাটির যাত্রা শুভ হোক। নতুন প্রজন্মের মাঝে গুণীজনদের পরিচিতি ছড়িয়ে দেওয়ার যে উদ্যোগ গুণীজন কর্মসূচি নিয়েছে তা সফল হোক, এই প্রত্যাশা রইলো সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে।

ভাষাশহীদ স্মরণে

ভাষা আন্দোলনের জন্মকথা

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্মের তিন মাস পর করাচীতে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা গণ্য করার এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংবাদ পরদিন ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। ঐদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সাধারণ ছাত্ররা সমাবেশ করে। সমাবেশের পর এক বিরাট মিছিল সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন-সংগ্রামের প্রথম লড়াকু সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৪৮ সালের ২৪ জানুয়ারি তিনিই প্রথম পাকিস্তানের গণপরিষদে (করাচিতে) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। সেদিন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেই প্রস্তাবনাতে বলেছিলেনঃ Out of six crores and ninty lakhs people inhabiting this state, 4 crores and 40 lakhs of people speak Bengali language. So, sir, what should be the State language of the state? The state language of the state should be the language which is used by the majority of the people of the state, and for that, sir, I consider that Bengali language is a lingua franca of our state.

ওই অধিবেশনে মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীসহ বাঙালী পার্লামেন্ট সদস্যদের একাংশ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দিলেও মুসলিম লীগ সমর্থিত এমপিরা এর বিপক্ষে অবস্থান নেন।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনের প্রথম দিনে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটির ওপর দুটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উত্থাপিত প্রস্তাব নিয়ে গণপরিষদে তুমুল তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই প্রস্তাবটি ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এর উদ্দেশ্য'। এই প্রস্তাবের আরো বিরোধিতা করেন পূর্ব-বাংলার গণপরিষদের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীর মনোভাব হচ্ছে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে'।

২৫ ফেব্রুয়ারির আলোচনা শেষে গণপরিষদের মুসলিম লীগের বাঙালী সদস্যরা বাংলাকে পরিষদের রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে ভোট দেয়। সেই খবরে ঢাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালন হয়। ২ মার্চ ঢাকায় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভায় গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। পরিষদের ডাকে ১১ মার্চ হরতাল পালন হয়। ১১ মার্চে ছাত্র জনতার উপর প্রশাসনিক গুন্ডা বাহিনীর নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১২ মার্চ বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ এবং ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৪ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালন করা হয়। ঢাকার বাইরে সারা দেশে ভাষা আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। ছাত্র ফেডারেশন, মুসলিম ছাত্র লীগ, ছাত্র এসোসিয়েশন, ছাত্র সংঘ, যুবলীগ প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগে জেলায় জেলায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে নাজিম উদ্দীন ৮ দফা চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন।

১৬ মার্চ ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ১৭ মার্চ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১৯ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ ঘোষণা করলেন- "পাকিস্তনের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্যকোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে কেউ যদি আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু"।

এরপর ২৪ মার্চ সকালে জিন্নাহর সম্মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তনে জিন্নাহ যখন আবার বলেন "উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"; তখন মিলনায়তনে উপস্থিত বেশ কিছু ছাত্র একসঙ্গে না, না বলে উঠে। এই দিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দলের সাথে জিন্নাহ বৈঠক করে। বৈঠকে সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিরা জিন্নাহকে অপমান করে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হলেও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় বলেন "সহজ ও দ্রুত যে হরফের মারফত ভাষা পড়া যায় সেই হরফই সবচাইতে ভাল। সুতরাং দ্রুত লিখন ও পঠনের পক্ষে সুবিধাজনক বলে আরবীকেই পাকিস্তানের হরফ করা উচিত।"

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপনা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় অধিবেশন চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংসদ ভবন অভিমুখে যাত্রা করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবী হরফ চাই না' ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত ছাত্র মিছিলটির উপরে পুলিশ হামলা চালায় এবং কয়েকজন ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার করে।

১৯৫০ সালের ১১ মার্চ দলমত নির্বিশেষে রাষ্ট্রভাষা বাংলা সমর্থক প্রতিটি সংগঠন থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৫১ সাল জুড়ে ঢাকার বাইরে সারা দেশে ভাষা আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দেয়। যার কারণে ১৯৫২ সালে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই আন্দোলন ছাত্র আন্দোলন থেকে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টনে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু"।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। ৩১ জানুয়ারি বিকেলে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সমাবেশে সর্বসম্মতভাবে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ'। ৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট পালিত হয়। ঐদিন প্রায় ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর একটি দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিল ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়ে শেষ হয় মিছিল পরবর্তী জনসভা। ২১ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট পালনের জন্য ১১ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

১১ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালনের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা পতাকা বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করা হয়। এই টাকার একাংশ দিয়ে 'আমাদের ভাষার লড়াই' (বদরুদ্দিন উমর) এবং 'রাষ্ট্রভাষা কি এবং কেন? (আনিসুজ্জামান) পুস্তিকা দু'টি বের করা হয়।

সরকার ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিকে তছনছ করার জন্য ২০ তারিখ সন্ধ্যায় একমাসের জন্য ঢাকায় সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে।

'৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সারা দেশে আন্দোলনের প্রস্তুতি দিবস। ওই দিন সকাল ৯ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিমনেসিয়াম মাঠের পাশে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত) গেটের পাশে ছাত্র-ছাত্রীদের জমায়েত শুরু হতে থাকে। সকাল ১১ টায় কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন, গাজীউল হক প্রমুখের উপস্থিতিতে ছাত্র সমাবেশ শুরু হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালের দিকে ১৪৪ ধারা ভংগের ব্যাপারে ছাত্র-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এস এম হোসেইন-এর নেতৃত্বে কয়েকজন শিক্ষক সমাবেশ স্থলে যান এবং ১৪৪ ধারা ভংগ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করেন।

বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত উপস্থিত ছাত্রনেতাদের মধ্যে আব্দুল মতিন এবং গাজীউল হক ১৪৪ ধারা ভংগের পক্ষে মত দিলেও সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় বাংলার দামাল ছেলেরা দমনমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। উপস্থিত সাধারণ ছাত্ররা স্বত:স্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভংগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের অন্তর্গত) দিকে যাবার উদ্যোগ নেয়। অধিকার আদায়ের দাবিতে শত শত বিদ্রোহী কণ্ঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবীতে আন্দোলোন তীব্র হয়ে উঠে। পুলিশের সঙ্গে ছাত্র জনতার সংঘর্ষ হয়। শ্লোগানে শ্লোগানে কেঁপে উঠে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলি বর্ষণ শুরু করে। গুলিতে ঘটনাস্থলেই আবুল বরকত, রফিক উদ্দীন এবং আব্দুল জব্বার নামের চার তরুণ শহীদ হন। রফিক, জব্বার, বরকত, শফিকসহ নাম না জানা আরও অনেকের সাথে সালামও সেদিন গুলিবিদ্ধ হন।

মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে পৃথিবীতে যে সকল আন্দোলন এ যাবতকালে সংগঠিত হয়েছে, তার মধ্যে বাঙ্গালীর ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন শ্রেষ্টতম। যার কারণে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

তথ্যসূত্র : www.biplobiderkotha.com

আবুল বরকত

আবুল বরকত একজন ভাষা শহীদ। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ভাষা সৈনিক আবুল বরকতের জন্ম ১৯২৭ সালের ১৩ জুন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা নামক একটি ছোট গ্রামে। আবুল বরকতের ডাক নাম ছিল আবাই। বাবা শামসুজ্জোহা। মা হাসিনা বিবি।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম তালিবপুর ইংলিশ হাই স্কুলে ভর্তি হন। ওই স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে মেট্রিক পাশ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ববাংলায় চলে আসেন। ঢাকার পুরানা পল্টনে বিষ্ণু প্রিয়া ভবনে তাঁর মামা আব্দুল মালেক সাহেবের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। ওই বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে তিনি অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন এবং এম.এ. শেষ পর্বে ভর্তি হন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত মাটিতে পড়ে যান। প্রথমে কেউ বুঝে উঠতে পারেনি, ততক্ষণে রক্তধারা ছুটে মাটি ভিজে যাচ্ছে। তলপেটে গুলি লেগেছিল তাঁর। পরনের নীল হাফ শার্ট, খাকি প্যান্ট ও কাবুলী স্যান্ডেল রক্তে ভিজে যাচ্ছে। দু'তিন জন ছুটে এসে সুঠামদেহী বরকতকে কাঁধে তুলে জরুরী বিভাগের দিকে দৌড়াতে থাকেন। বরকত বলেছিলেন: খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি বাঁচবনা, পুরানা পল্টনের মামার বাড়িতে বিষ্ণু প্রিয়া ভবনে খবর পৌঁছে দিবেন। ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য সেই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। রাত ৮ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরী ওয়ার্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

তথ্যসূত্র : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী

শফিউর রহমান

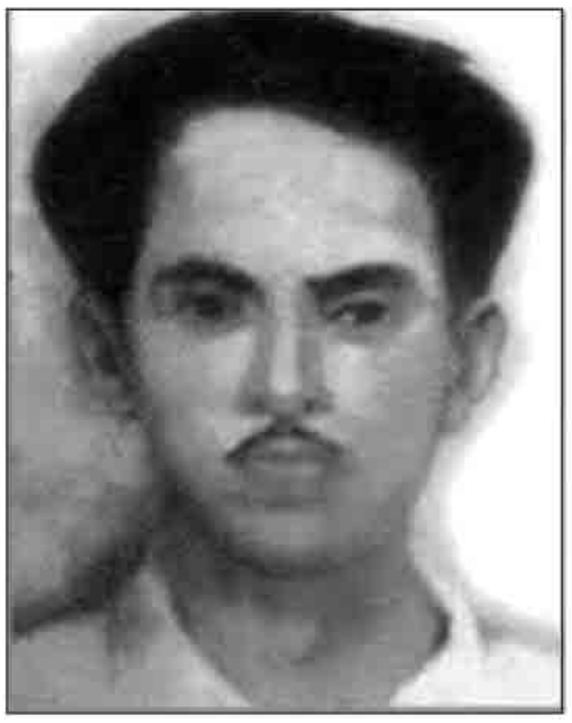

ভাষা সৈনিক শফিউর রহমানের জন্ম ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি। শফিউর রহমান বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোন্নগরে। বাবা মাহবুবুর রহমান। তিনি ছিলেন ঢাকার পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়াশুনা শেষ করে কলকাতার গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজে ভর্তি হন। ওই কলেজ হতে তিনি আই.কম. পাস করেন। আই.কম. পাসের পর শফিউর রহমান চব্বিশ পরগণা সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানীর চাকরি শুরু করেন।

১৯৪৫ সালের ২৮ মে শফিউর রহমান কলকাতার তমিজউদ্দিনের কন্যা আকিলা খাতুনকে বিবাহ করেন। আকিলা খাতুনের বয়স তখন ১২ বছর।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তাঁর বাবা মাহবুবুর রহমান পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকাতে পাকিস্তান পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে সুপারিনটেনডেন্ট পদে চাকুরি নেন। শফিউর রহমানও তাঁর বাবার সঙ্গে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে তিনি বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি ঢাকা হাইকোর্টে হিসাবরক্ষণ শাখায় কেরানী পদে চাকুরী শুরু করেন। শফিউর রহমানের পাঁচ ভাই ছিল।

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
উর্মি লোহানী
শেখ রফিক

সম্পাদক
মৌরী তানিয়া

প্রকাশক
গুণীজন কর্মসূচি, ডি.নেট

মুদ্রণে
চিত্রকল্প

অলংকরণ
মোঃ শাহজাহান কাজী

যোগাযোগ
৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.gunijan.org.bd
ফোন ঃ +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০২৯১৩১৪২৪
+৮৮০১৮১৪৬৫২৪৯৬-৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০২৮১৪২০২১

কাঁকন বিবি

চতুর্থবার তিনি ভিক্ষে করতে করতে পাকিস্তনিদের টেংরা ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছেন। ঠিক জুম্মার আযানের সময়, রাস্তায় তাঁকে আটকে ফেলল কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য। সৈন্যরা প্রথমে তাঁর সঙ্গে যে মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ আছে সেটা স্বীকার করানোর চেষ্টা করে কিন্তু তাঁর এক কথা, আমি আমার স্বামী আব্দুল মজিদ খানের খোঁজে ক্যাম্পে যাই।

এরপরই শুরু হয় তাঁর উপর প্রচন্ড শারীরিক নির্যাতন নির্যাতনের এক পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মাথায় পানি ঢেলে তাঁকে সুস্থ করার পর আবার শুরু হয় অত্যাচার। গাছের সাথে বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে পিটাতে শুরু করলো তাঁকে। সমস্ত শরীর দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। এইভাবে দীর্ঘক্ষণ থাকার পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। এক পর্যায়ে পাকহানাদাররা মোটা লোহার শিক গরম করে তাঁর উরু দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এই বীভৎস নির্যাতনের পরও তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বের করতে পারেনি পাকিস্তানি সৈন্যরা।

কাঁকন বিবিকে নির্যাতনের এক পর্যায়ে পাকবাহিনীর বড় অফিসার এল সেখানে, সে এসে দেখে কাঁকন বিবি অজ্ঞান। অফিসার ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার এসে ইনজেকশান দিয়ে কাঁকন বিবির জ্ঞান ফেরাল যন্ত্রণায় তিনি সবকিছু অন্ধকার দেখছেন। এর মধ্যেই অফিসার তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন ক্যাম্পে যাও'। কাঁকন বিবি অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলেন, 'স্বামীর খোঁজে'। অফিসার আবার জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমার স্বামী?" কাঁকন বিবি বললেন, আব্দুল মজিদ খান। অফিসার বলল, 'সে কোথায় থাকে?' কাঁকন বিবি বললেন, 'সিলেটে' ব্যস, এটুকুই আর কিছু বলতে পারেননি কাঁকন বিবি। আবার তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

অফিসার তখন ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সিলেটে ওয়ারলেস করে আব্দুল মজিদ খানের কথা জানতে পারলেন। অফিসার মজিদ খানের কাছে জানতে চান, কাঁঠালবাড়িতে তার কোনো স্ত্রী আছে কি না? মজিদ খান বলেন, কাঁকন বিবি নামে তার স্ত্রী কাঁঠালবাড়িতে থাকেন এবং সে খাসিয়া উপজাতি। অফিসার তার কথা শুনে কাঁকন বিবিকে আর কোনো অত্যাচার করেনি এবং তাঁকে ছেড়ে দেন।

কিন্তু ছেড়ে দিলেও কাঁকন বিবির অবস্থা সঙ্গীন। তাঁর যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। তাঁকে নেয়ারও কেউ নেই। তিনি রাস্তাতেই অসুস্থ শরীর নিয়ে পড়ে রইলেন। পরে অবশ্য লোকজন তাঁকে ধরাধরি করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

এরপর মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টিই কাঁকন বিবির কেটেছে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আর কোনো কাজকর্ম করতে পারেননি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য কাঁকন বিবিকে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ-সিলেট অঞ্চলটি ছিল পাঁচ নম্বর সেক্টরের অধীন। এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল মীর শওকত আলী। কাঁকন বিবি যে গ্রামে থাকতেন তার পাশেই মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। আবার এই ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরেই ছিল পাকিস্তানিদের ক্যাম্প, যা স্থানীয়ভাবে টেংরা ক্যাম্প নামে পরিচিত। মুক্তিবাহিনীর যে ক্যাম্প ছিল তার কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন শহীদ মিয়া। মীর শওকত আলী একদিন এই ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। তিনিই মূলত কাঁকন বিবিকে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থেকে খবর সংগ্রহের কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহিত করেন। কাঁকন বিবির সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি তাঁকে কাজের গুরুত্বও বুঝিয়ে বলেন। কাঁকন বিবির স্বামী যেহেতু আগে পাকিস্ড়ানি ক্যাম্পে কাজ করত। সুতরাং তাঁর পক্ষেই সম্ভব সেখানকার খবরাখবর এনে মুক্তিবাহিনীর কাছে প্রেরণ করা। কাঁকন বিবিও উৎসাহ নিয়ে দেশের জন্য কিছু একটা করতে পারবেন এই ভেবে রাজি হয়ে যান।

ইতিমধ্যে তাঁর ভগ্নিপতি খুশি কমান্ডারকে পাকিস্তানিরা হত্যা করে ফেলে। পিতার মতো স্নেহ দিয়ে যে লোকটি তাঁকে বড় করে তুলেছিল, যে ছিল তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী সেই খুশি কমান্ডারকে একদিন পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনায় কাঁকন বিবি খুবই কষ্ট পান। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হন একজন 'ইনফরমার' হিসেবে, যাঁর কাজ ছিল পাকিস্তানি ক্যাম্পে ঢুকে তাদের হাতিয়ারের ধরন, সংখ্যা ও সৈনিকদের অবস্থান সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা। স্বামী শাহেদ আলী তাঁর এই কাজে বাধা দিলেও তিনি তা উপেক্ষা করেন।

সেই কঠিন দায়িত্ব নিয়ে একদিন ভিক্ষুকবেশে টেংরা ক্যাম্পে যান। ঢুকে পড়েন টেংরা ক্যাম্পের ভিতর ভিক্ষা চান পাকিস্তানি মিলিটারিদের কাছে। তারা কিছু ময়দা ও আটা ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা করার পাশাপাশি মিলিটারিদের কাছে তাঁর প্রথম স্বামী আব্দুল মজিদ খানের খোঁজও করেন নানা কায়দায়। কিছুক্ষণ ক্যাম্পের ভেতর অবস্থান করে সবকিছু দেখার চেষ্টা করেন এবং প্রথম দিন তিনি খুব ভালভাবেই তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। টেংরা ক্যাম্পে তিনি যা দেখেছেন তা সবই এসে জানান কোম্পানি কমান্ডার শহিদ মিয়াকে। মুক্তিবাহিনী তখন সেই মোতাবেক তাঁদের অপারেশন চালায় এবং এতে তাঁরা সফলও হয়।

দ্বিতীয় দিনও কাঁকন বিবি একই কায়দায় টেংরা ক্যাম্পে প্রবেশ করেন। তখন ক্যাম্পের একটি ঘরে কয়েকজন মেয়েকেও দেখতে পান। মেয়েরা ছিল ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। কাঁকন বিবির বুঝতে বাকি থাকল না এদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে এবং শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। দ্বিতীয় দিন তিনি যখন মিলিটারির কাছে তাঁর স্বামীর খবর জানতে চান তখনই তাঁকে আটক করে ফেলা হয় কয়েকজন পাক হানাদার বাহিনীর সদস্য মিলে চালায় শারীরিক নির্যাতন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত কাঁকন বিবি একজন 'ইনফরমার' এটা তারা ভাবতে পারেনি। নির্যাতন শেষে তারা কাঁকন বিবিকে ছেড়ে দেয়। অত্যাচারের মুখেও কাঁকন বিবি ঠিকই সেদিন সমস্ত তথ্য এনে কোম্পানি কমান্ডারকে জানান। তিনি কমান্ডারকে বুঝতে দেননি তাঁর উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পশুরা।

এই ঘটনার পর অবশ্য কাঁকন বিবি বেশ কিছুদিন আর টেংরা ক্যাম্পে যাননি। টেংরা ক্যাম্পে 'ইনফরমার' হিসেবে কাজ করেছেন কাঁকন বিবি, এই খবর জানামাত্রই দ্বিতীয় স্বামী শাহেদ আলী রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করলেন। এক পর্যায়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন 'নষ্টা মেয়ে' বলে। একমাত্র মেয়ে সখিনা বিবিকে শাহেদ আলী নিজের কাছেই রেখে দিলেন।

কাঁকন বিবি এখন একেবারেই গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন কোথাও যাওয়ার তাঁর কোনো জায়গা রইল

না। এই দু:সময়েও কাঁকন বিবি 'ইনফরমার' হিসেবে কাজ করার জন্য যান সুনামগঞ্জে অবস্থিত পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে। সেখান থেকে যান সিলেট ক্যাম্পে। পরে যান গোবিন্দগঞ্জ, জাউয়া বাজার ক্যাম্পে সব জায়গাতেই তাঁর একই কাজ ক্যাম্পের অবস্থান, সৈন্য সংখ্যা, হাতিয়ার ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসা। যেতেন সেই ভিক্ষা করার বেশেই। পাকিস্তানি সৈন্যরা কাঁকন বিবিকে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালাত। এতকিছুর পরেও কাঁকন বিবি কিন্তু নিজের কাজ সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। কারণ তাঁর দেয়া তথ্য মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে জয়ের ব্যাপারে মূল ভূমিকা পালন করত।

কমান্ডার শহিদ মিয়ার নির্দেশে তৃতীয়বারের মতো তিনি আবার যান টেংরা ক্যাম্পে। তৃতীয়বারও নানা নির্যাতনের মুখে পড়েন টেংরা ক্যাম্পে। তখন আরও অনেক বাঙালী মেয়েকেই বন্দি করে রেখেছে পাক হানাদার বাহিনী। কাঁকন বিবি ক্যাম্প থেকে খবর সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর কাছে প্রেরণ করছেন তা স্থানীয় কয়েকজন রাজাকার সন্দেহ করে। তবে তারা এ ব্যাপারে খুব বেশি নিশ্চিত ছিল না। তবু ওইসব রাজাকাররা পাকিস্তানি ক্যাম্পে গিয়ে অফিসারদের কাছে তাদের সেই সন্দেহের কথা জানায়। তাঁর ভগ্নিপতি খুশি কমান্ডার যে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিল এবং তাঁকে যে এ কারণে হত্যা করা হয়েছে সে কথাও জানায়। এরপর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে যেয়ে অকথ্য নির্যাতন চালায় যে নির্যাতনের বর্ণনা শুরুতেই দেয়া হয়েছে।

কাঁকন বিবির জন্ম কোন সালে বা কোন তারিখে তা তিনি জানেন না। তাঁর ভাষ্যমতে তিনি এখন (২০১১) একাশি বছরের বৃদ্ধা। জন্মেছিলেন বৃটিশ ভারতের মিজোরাম প্রদেশে এক খাসিয়া পরিবারে বাবা গিসয়। মা মেলি গিসয়। মেলি দম্পতির ছিল ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে। বড় ছেলে উহর, মেঝ ছেলে উসাল, ছোট ছেলে উফান আর বড় মেয়ে কাফল। সবার ছোট মেয়ে কাঁতেক নিয়তা বা কাঁকন বিবি। পরিবারটি ছিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

কাঁকন বিবির বয়স যখন ছয় মাস তখন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর বাবা গিসয় মৃত্যুবরণ করেন। বাবার মৃত্যুর মাস ছ'য়েকের মাথায় চিরবিদায় নেন মা মেলিও। অভাবের সংসারে এই পাঁচটি এতিম সন্তান একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ তখন পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কাঁকন বিবির বয়স যখন ৮/৯ মাস তখনই তাঁর বড় বোন কাফলের বিয়ে হয়ে যায় এক বাঙালী মুসলমানের সাথে। তাঁর নাম খুশি কমান্ডার। মূলত তিনি বৃটিশ আমলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে চাকরি করতেন এ কারণেই লোকে তাঁকে কমান্ডার বলত।

মা মারা যাবার পর দুগ্ধ শিশু কাঁকন বিবিকে দেখাশোনা করতেন তাঁর বড় বোন কাফল। বিয়ের পরও তিনি স্বামীর সহযোগিতায় কাঁকন বিবিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে সন্তানের মতো মানুষ করতে থাকেন। খুশি কমান্ডারের গৃহস্থ পরিবারেই কাঁকন বিবির বেড়ে উঠা। মা বলতে তিনি বোঝেন বড় বোন কাফলকে আর বাবা বলতে বোঝেন খুশি কমান্ডারকে।

কাঁঠালবাগান গ্রামটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছে। গ্রাম থেকে একটু দূরেই ছিল পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে সৈনিক হিসাবে কাজ করত পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের আব্দুল মজিদ খান। দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া খুশি কমান্ডারের সাথে মজিদ খানের বেশ চেনা-জানা ছিল। বাড়িতেও আসতেন মাঝেমধ্যে। খুশি কমান্ডারই একসময় আবদুল মজিদ খানের সাথে কাঁকন বিবির বিয়ের ব্যবস্থা করেন (১৯৫৮/৫৯ সাল)। বিয়ে হওয়ার পর কাঁকন বিবি ভগ্নিপতির বাড়ি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে কর্মস্থল বোগলা ক্যাম্পে এসে ওঠেন। সেখানেই নতুন করে সংসার শুরু করেন বোগলা ক্যাম্পে তিনি প্রায় পাঁচ বছর ছিলেন। আব্দুল মজিদ খান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বদলিও হতেন। কাঁকন বিবিকেও তিনি সাথে নিয়ে যেতেন। সে সময় কাঁকন বিবি সুনামগঞ্জে প্রায় ছয় মাস, সিলেটে প্রায় সাত মাস এবং ছাতকেও কিছুদিন স্বামীর সাথে কাটান। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ আট বছরে তাঁদের ঘরে তিনটি সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু জন্মের পরপরই তারা মৃত্যুবরণ করে। খুব সম্ভবত এ কারণেই আব্দুল মজিদ খান সিলেট আকালিয়া ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় কাঁকন বিবিকে পরিত্যাগ করে চলে যান। কাঁকন বিবি একা হয়ে পড়েন। স্বামীর খোঁজে তিনি ক্যাম্পের অন্যান্য সৈনিকদের কাছে অভিযোগ করেন, অফিসে গিয়েও নালিশ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে কাঁকন বিবি আবার তাঁর ভগ্নিপতি ও বোনের সংসারে ফিরে আসেন। এরপর আর কোনোদিন আব্দুল মজিদ খানের সাথে তাঁর দেখা হয়নি।

স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে পুনরায় কাঁঠালবাড়িতে ফিরে আসায় পরিবারের অনেকেই মনক্ষুন্ন হন বিচলিত হন ভগ্নিপতি খুশি কমান্ডারও। কিন্তু তিনি যেহেতু কাঁকন বিবিকে তাঁর অন্য চার সন্তানের মতোই বড় করে তুলেছেন। সে কারণে খুব বেশি ক্ষুব্ধও হতে পারলেন না। চেষ্টা করতে লাগলেন আবার তাঁকে বিয়ে দেয়া যায় কি না। এই অবস্থায় কাঁকন বিবি প্রায় বছর দেড়েক ভগ্নিপতির সংসারেই থাকলেন। শেষ পর্যন্ত খুশি কমান্ডারই আবার প্রতিবেশী শাহেদ আলীর সাথে কাঁকন বিবির পুনরায় বিয়ে দেন। শাহেদ আলী ছিলেন ছোটখাটো কৃষক। তাঁর আগেও সংসার ছিল। কিন্তু সেই সংসারে কোনো সন্তান ছিল না। মূলত সন্তানের আশাতেই তিনি কাঁকন বিবিকে বিয়ে করেন। শাহেদ আলীর সাথে কাঁকন বিবির সংসার টিকেছিল দুই বছর। এরমধ্যেই কাঁকন বিবির গর্ভে জন্ম নেয় এক কন্যা সন্তান। নাম সখিনা বিবি। এর মধ্যেই শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীন দেশে সবাই নিজের মতো করে আবার জায়গা করে নিল। কিন্তু বীরাঙ্গনা কাঁকন বিবির কোথাও জায়গা হলো না। অবশেষে কাঁকন বিবি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। একজন বীরাঙ্গনাকে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের পরিবারে আশ্রয় দেন। এখানে ছিলেন '৭৫-এর শুরুর দিক পর্যন্ত। এরপর চলে যান নিজের গ্রামে। গ্রামে বসেই মুজিব হত্যার খবর পান। কাঁকন বিবির বুকটা ভেঙে যায়।

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৩, ফেব্রুয়ারি ২০১১

ভাষাশহীদ স্মরণে

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর ২২ ফেব্রুয়ারি সারাদেশের স্বত:স্ফূর্তভাবে ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসেন এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবিতে রাজপথ অবরোধ করে রাখেন। ওই দিন শফিউর রহমান সকাল দশটায় অফিসে রওনা হন। সেদিন পাজামা, শার্ট, গেঞ্জি এবং কোট পরেছিলেন। পায়ে ছিল জুতা। সাইকেলে তিনি অফিসে যাতায়াত করতেন। সকাল সাড়ে দশটার দিকে নবাবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে বিক্ষোভরত জনতার উপর পুলিশ বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। শফিউর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু অস্ত্রোপচার সফল হয়নি। ওই দিন সন্ধ্যা সাতটায় হাসপাতালে তিনি মারা যান।

তথ্যসূত্র : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী

রফিক উদ্দিন

ভাষাশহীদ রফিক উদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর। মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার পারিল বলধারা গ্রামে। বাবা আবদুল লতিফ। মা রাফিজা খাতুন।

রফিক উদ্দিনের বাবা আবদুল লতিফ ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি কলকাতায় ব্যবসা করতেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রফিক উদ্দিনের বাবা ঢাকায় চলে আসেন এবং বাবুবাজারে আকমল খাঁ রোডে পারিল প্রিন্টিং প্রেস নামে ছাপাখানা চালু করেন।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। শৈশবে প্রাথমিক পড়ালেখা শুরু কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউটে। তারপর ১৯৪৯ সালে মানিকগঞ্জের বায়রা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ওই স্কুল থেকে তিনি ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর রফিক উদ্দিন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্রনাথ কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হন। আই.কম. ক্লাস পর্যন্ত পড়ালেখার পরে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ঢাকায় এসে পিতার সঙ্গে প্রেস পরিচালনা করতে শুরু করেন। পরে আবার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে পড়ার সময়ে তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখের রাস্ড়য় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র-জনতার মিছিলে রফিক অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেল প্রাঙ্গনে পুলিশ গুলি চালালে সেই গুলি রফিক উদ্দিনের মাথায় লাগে। গুলিতে মাথার খুলি উড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মেডিকেল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তাঁর মৃতদেহ পড়ে ছিল। ছয় সাত জন ধরাধরি করে তাঁর মৃতদেহ এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় এনে রাখেন।

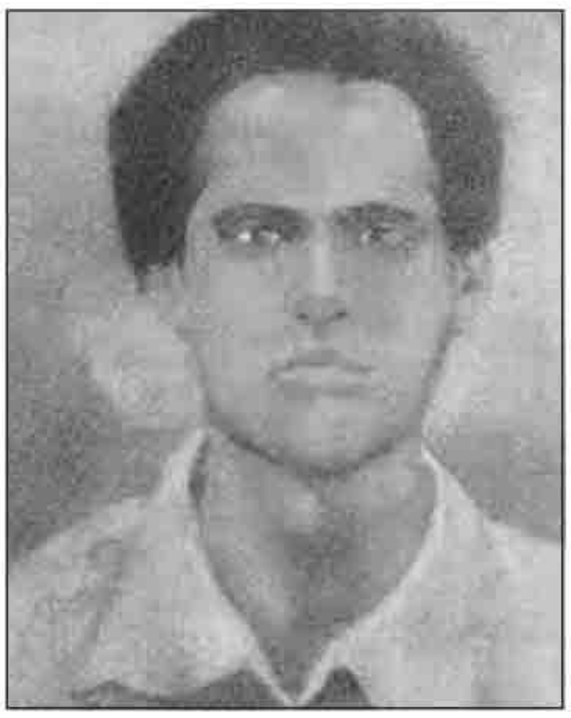

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে রফিকই প্রথম গুলিবিদ্ধ হন। তাই বলা যায় তিনিই ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। রফিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালে তিনি পারিল-বলধারা যুবক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ দাফন করা হয়েছিল আজিমপুর গোরস্থানে।

তথ্যসূত্র : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী

আবদুল জব্বার

ভাষা সৈনিক আবদুল জব্বারের জন্ম ১৩২৬ বাংলা, ২৬ আশ্বিন। ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার পাঁচাইর গ্রামে। বাবা আবদুল কাদের।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক পড়াশুনা শুরু করেন। পাঠশালায় কিছুদিন পড়াশুনা করার পর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তিনি বাধ্য হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। যুক্ত হন কৃষিকাজে। বাবাকে সার্বক্ষণিক কৃষিকাজে সাহায্য করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর।

আবদুল জব্বার ১৫ বছর বয়সে পরিবারের সাথে রাগ করে জীবন সংগ্রামের অজানা পথে বেরিয়ে পড়েন। এই অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজের কারণে তিনি অনেক কষ্ট, ক্ষুধা, যন্ত্রণা নিয়ে অবশেষে নারায়ণগঞ্জে এসে জাহাজ ঘাটে কাজে যুক্ত হন। বছরখানেক পর তিনি এক ইংরেজ সাহেবের সান্নিধ্যে আসেন। সাহেব তাঁকে একটি চাকরি দিয়ে বার্মায় পাঠান। সেখানে আবদুল জব্বার দশ-বারো বছর অবস্থান করে দেশে ফিরে আসেন। আবদুল জব্বার দেশে ফিরে আমেনা খাতুন নামে এক যুবতীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

আবদুল জব্বার-আমেনা খাতুন পরিবারে ১৯৫১ সালের শেষের দিকে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। জন্মের ৪ মাস পরে আবদুল জব্বারের শাশুড়ী ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। শাশুড়ীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকায় আসেন।

শাশুড়ীকে হাসপাতালে ভর্তি করে আবদুল জব্বার মেডিকেলের ছাত্রদের আবাসস্থল (ছাত্র ব্যারাক) গফরগাঁও নিবাসী হুরমত আলীর রুমে (২০/৮) উঠেন। ২১ ফেব্রুয়ারী আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হলে, কি হয়েছে দেখবার জন্য তিনি রুম থেকে বের হয়ে আসেন। ঠিক তিনি যখন ছাত্রদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তখনই পুলিশ গুলি শুরু করে। জব্বার গুলিবিদ্ধ হন। ছাত্ররা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা জব্বারকে মৃত ঘোষণা করে।

তথ্যসূত্র : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী

আবদুস সালাম

ভাষাশহীদ আবদুস সালামের জন্ম ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর। ফেনী জেলার (শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে) দাগনভুঞা উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের লক্ষণপুর গ্রামে। বাবা ফাজিল মিয়া। মা দৌলতের নেছা। ৪ ভাই ৩ বোনের মধ্যে সালাম সবার বড়।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে তিনি মাতুভূঞা করিম উল্যাহ স্কুলে ভর্তি হন। ওই স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী পাশ করে দাগনভুঞার কামাল আতাতুর্ক হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। নবম শ্রেণীতে পড়ালেখা চলাকালীন জেঠাতো ভাই হাবিবের সহযোগিতায় সালাম পরিবারে স্বচ্ছলতা লাভের স্বপ্নে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে ৫৮, দিলকুশা, মতিঝিল ডাইরেক্টর অব ইন্ডাষ্ট্রিজ কমার্স এ পিয়নের চাকুরীতে যোগদান করেন। বাস করতেন নীলক্ষেত ব্যারাকে।

২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র-জনতার মিছিলে রফিক, জাব্বার, বরকত, শফিকসহ নাম না জানা আরও অনেকের সাথে সালামও সেদিন গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ সালামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। সে দিনই সন্ধ্যায় টেলিগ্রামে সালামের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পান সালামের বাবা ফাজিল মিয়া, জেঠাতো ভাই হাবিব উল্যাহ ও প্রতিবেশী মকবুর আহমদ। ২২ ফেব্রুয়ারী সকালে তারা ঢাকায় ছুটে আসেন। প্রায় দেড় মাস ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে ওই বছরের ৭ এপ্রিল তিনি মারা যান। (সূত্র : ৮ এপ্রিল, দৈনিক আজাদ)

শহীদ সালামের চাকুরী স্থলে তাঁর ছোট ভাই আবদুস সোবহান স্থলাভিষিক্ত হন। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠানটি শিল্প দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। সালামের রক্ত মাখা শার্টসহ আরো কিছু স্মৃতি সম্বলিত ট্রাংকটি স্বাধীনতার কয়েক বছর পর চুরি হয়ে যায়। সালামের শেষ স্মৃতি দু'খানা ছবি ছিল তা ফেনীর আওয়ামী লীগ নেতা খাজা আহমদকে প্রয়োজনে দেয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সে ছবির খোঁজ করে পাওয়া যায়নি। ■

তথ্যসূত্র : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিএ পরীক্ষা শেষে মাষ্টারদার নির্দেশে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে চলে আসেন। ১৯৩২ সালে বি এ পাস করার পর চট্টগ্রাম অপর্ণাচরণ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় বিপ্লবী কাজে আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার তাগিদ দিলেন মাষ্টারদা সূর্যসেন।

১৯৩২ সালের মে মাসে প্রীতিলতার জন্মস্থান ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাষ্টারদা তাঁর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেন। এই বৈঠক চলার সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে বিপ্লবীদের বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে প্রাণ দেন বিপ্লবী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। মাষ্টারদা প্রীতিলতাকে নিয়ে বাড়ির পাশে ডোবার পানিতে ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর মাস্টারদা বলেন, 'প্রীতি, তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে স্কুলের কাজে যোগ দেবে, তাহলে গত রাতের ঘটনায় কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না।' সাবিত্রী দেবীর বাড়িটি পুলিশ পুড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার প্রীতিলতাকে সন্দেহ করা শুরু করে। মাষ্টারদার নির্দেশে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। অন্য একটি বিপ্লবী গ্রুপ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থ হয়। যার কারণে মাষ্টারদা প্রীতিলতাকে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এই জন্য কাট্টলি সমুদ্র সৈকতে বিপ্লবী দলকে মাষ্টারদা সামরিক প্রশিক্ষণ দেন।

১৯৩২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে এক গোপন বৈঠকে মাস্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা করার জন্য একটি গ্রামের উদ্দেশ্যে পুরুষের বেশে রওনা দেন। কিন্তু পথে পাহাড়তলীতে কল্পনা দত্ত ধরা পড়েন। প্রীতিলতা নিরাপদে নির্দিষ্ট গ্রামে এসে পৌঁছেন। এখানেই প্রীতিলতার নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য কাট্টলীর সাগরতীরে প্রীতিলতা ও তাঁর সাথীদের অস্ত্র শিক্ষা শুরু হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে বীরকন্যা প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সফল হন। আক্রমণ শেষে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এ অবস্থায় ধরা পড়ার আগে সঙ্গে রাখা সায়ানাইড বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। কারণ ধরা পড়লে বিপ্লবীদের অনেক গোপন তথ্য ব্রিটিশ পুলিশের মারের মুখে ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

প্রীতিলতা মারা যাওয়ার আগে মায়ের কাছে লিখেছিলেন, 'মাগো, অমন করে কেঁদোনা! আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কী করব মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভাবে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা! তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?' ■

তথ্যসূত্র:

১। বীর কন্যা প্রীতিলতা: পূর্ণেন্দু দস্ড়িদার, প্রকাশকাল ১৩৭৯ বাংলা
২। স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম: পূর্ণেন্দু দস্ড়িদার, প্রকাশকাল ১৩৭৪ বাংলা, প্রকাশক: চট্টগ্রাম বই ঘর
৩। www.biplobiderkotha.com : সম্পাদক: শেখ রফিক

মূল লেখক: গুণীজন দল

কাঁকন বিবি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

'৭৫-এর পর থেকে প্রায় ২২ বছর কাঁকন বিবির কেটেছে স্থানীয় বাংলাবাজারের পাশে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে। মানুষের দেয়া খাবারই ছিল তাঁর সম্বল।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর কাঁকন বিবিকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কিছু লেখালেখি হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করেন। শেখ হাসিনাও কাঁকন বিবির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। তখন বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে আসে কাঁকন বিবিকে জাতীয়ভাবে তুলে ধরার জন্য। জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা তাঁকে সংবর্ধনা দেয়। কেউ কেউ কিছু মাসিক ভাতারও ব্যবস্থা করেন। এসব নিয়ে কাঁকন বিবি ও তাঁর মেয়ের পরিবার বেশ ভালোই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনকণ্ঠসহ সকলেই নিয়মিত মাসোহারা বন্ধ করে দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতা এখন তার সম্বল। ■

মূল লেখক: চন্দন সাহা রায়

গুণীজনের জীবনী জানতে দেখুন
www.gunijan.org.bd